আন্ত-ধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ)

ভাষান্তর ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রকাশ কাল ঃ বৈশাখ, ১৪০১
জেলকদ, ১৪১৪
এপ্রিল, ১৯৯৪

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

সাইয়্যেদনা আমীরুল মুমেনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ), খলিফাতুল মসীহ্, বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জলসায় 'Islam's Response to Contemporary Issues বা সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান-এর উপরে সঠিক দিক নির্দেশনা সম্বলিত অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল ঃ

1. Inter-Religious Peace and Harmony;
2. Social Peace in General;
3. Socio-Economic Peace;
4. Economic Peace;
5. Peace in national and international Politics;
6. Individual Peace.

আমরা, আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে, আপাততঃ Inter-Religious Peace and Harmony বক্তৃতাটির বঙ্গানুবাদ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলাম, আলহামদু লিল্লাহ্। আমরা আশা রাখি, ভবিষ্যতে বাকী বিষয়গুলিরও বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্। আমরা আপনাদের দোয়া প্রার্থী। আল্লাহ্ তায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন, আমীন।

আপনাদের

ঢাকা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৪ইং

(মোহাম্মদ মোস্তফা আলী)
ন্যাশনাল আমীর,
আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

আন্ত-ধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি

১। ধর্মীয় মূল্যবোধ অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে;
২। নবু'য়্যতের সার্বজনীনতা;
৩। সকল নবী সমান;
৪। প্রামাণিকত্ব সমান হলে কি পদমর্যাদা ভিন্ন হতে পারে?
৫। পরিত্রাণ কোন ধর্মের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না;
৬। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি সাধন;
৭। সার্বজনীনতার ধারণা;
৮। ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম;
৯। সংগ্রামের উপকরণ, বাধ্যবাধকতা নেই;
১০। যোগ্যতমের উত্তরণ;
১১। বাক-স্বাধীনতা;
১২। সমসাময়িক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ও মুক্তি;
১৩। ঈশ্বরনিন্দা;
১৪। আন্ত-ধর্মীয় সহযোগিতা;
১৫। উপসংহার।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

'নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী আগমন করেনি'- (৩৫ ঃ ২৫)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ
مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর উপরে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে তারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকাজ করে, না তাদের কোন ভয় থাকবে এবং না তারা দুঃখিত হবে' - (৫ ঃ ৭০)

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে

আজকের ধর্মীয় সামগ্রিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, ধর্মের অভ্যন্তরে একটা পরস্পর - বিরোধী অবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণভাবে তো ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে সেটাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে শক্ত হতেও দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে, প্রায় প্রতিটি ধর্মে এক প্রকার মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি ও প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু একটা মতাদর্শের তীব্র পশ্চাদমুখী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্ম পিছিয়ে পড়ছে। অপরাধ অবাধে সংঘটিত হচ্ছে। সত্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। সমতা এবং সুবিচার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতি সামাজিক দায়িত্বাবলী উপেক্ষিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, একটা স্বার্থপর ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা শক্তি অর্জন করছে। এমনকি, তা শক্তিলাভ করছে পৃথিবীর সেই দেশগুলোতেও, যেগুলো, আর যাই হোক, নিজেদেরকে ধর্মীয় বলেই দাবী করছে। এগুলো এবং এর সঙ্গে আরও বহু সামাজিক খারাপি, যা কিনা নৈতিকভাবে অবক্ষয়প্রাপ্ত একটা সমাজের প্রকাশ্য লক্ষণ, তা আজ পরিণত হয়েছে একটা নিয়মে। যদি কোন ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধগুলো সেই ধর্মের আত্মা এবং তার দেহ গঠন করে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে, সেই সকল মূল্যবোধের উপরে ক্রমাগত ক্রিয়াশীল একটা শ্বাসরোধ-প্রক্রিয়া চলছে, যা আমাদেরকে এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, যখন ধর্মের দৈহিক পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে, ঠিক তখনই সেই দেহ থেকে আত্মার অতিদ্রুত নির্গমন ঘটছে। সুতরাং আজ আমরা ধর্মের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করছি তা হচ্ছে, – ধর্মের ঐ তথাকথিত পুনরুজ্জীবনও যা, শবদেহের পুনরুত্থানও তা-ই, যা কিনা এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকবে যাদুকরের মড়া চালান দেওয়ার মতই। অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ নিশ্চলাবস্থা এবং উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতির অভাব সাধারণ ধার্মিক মানুষদের মধ্যে একঘেঁয়েমীর জন্ম দিয়েছে। তারা অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার যে প্রত্যাশা রাখে তা-ও পূরণ হয় না। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপে আজগুবী ঘটনাবলীর মাধ্যমে, তাদের মনোমত করে, দুনিয়াটাকে বদলায়ে ফেলার জন্য জাগতিক ঘটনাবলীও সংঘটিত হয় না। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী

রূপকাশ্রিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা দেখতে চায়, কিন্তু তেমন কিছুও ঘটে না। এরাই হচ্ছে সেই সব লোক যারা নতুন নতুন ধর্মমত সৃষ্টির উপদান যোগায়, আর সেই উপাদান হচ্ছে তাদের হতাশার গলিত লাশ। অতীত থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা থেকেই সুষ্টি হয় তাদের নতুন কিছু দিয়ে শূন্যতা পূরণের আকাঙ্খা।

এই সব ধবংসাত্মক প্রবণতা ছাড়াও, একটা চরম অসুবিধা সৃষ্টিকারী ব্যাপার যা, সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামীর পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করে ফেলছে। এই জাতীয় গোঁড়ামীর অভ্যুত্থানের দরুন একটা নেশাকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, যা আইডিয়া বা ধ্যান ধারণার অবাধ আদান প্রদান এবং আলাপ আলোচনার শুভ চেতনার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। যেন এতেও কিছুই হচ্ছে না। অসাধু রাজনীতিকদের স্বেচ্ছাচারিতা এই জাতীয় উত্তপ্ত আবহাওয়াকে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। যার দরুন ধর্মের আসল চেহারা কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ছে। উপরন্তু, ঐতিহাসিকভাবে আন্ত-ধর্মীয় বিবাদ বিসম্বাদ তো রয়েই গেছে। এছাড়াও, তথা কথিত 'ফ্রি মেডিয়া' বা অবাধ ও নিরপেক্ষ গণ-মাধ্যমগুলি সাধারণভাবে মুক্ত থাকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অদৃশ্য হাতের দ্বারা। ফলে, সেগুলো বিশ্ব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সুতরাং যখন কোন একটা দেশের গণ-মাধ্যম, সেই দেশের একই ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখপাত্র হিসেবে অপর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের নিন্দা-বিদ্বেষের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন পরিস্থিতিটা আরও বেশী জটিল আকার ধারণ করে। তখন ধর্মই এই সব কলহ বিবাদের প্রথম শিকারে পরিণত হয়। ধর্মের জগতে আজ পৃথিবীতে যা ঘটছে তাতে আমি সত্যি সত্যিই উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্য থেকে ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য একটা সত্যিকারের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের একটা গভীর আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এরূপ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সহকারে সেই কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম যাতে সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হতে পারে।

বিষয়টাকে আমি ভালভাবে বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

যেমন, আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মের জন্য যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মের দ্বারা সার্বজনীনভাবে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ধর্মকে ধর্মীয় সার্বজনীনতা স্বীকার করতে হবে, এবং তা এই অর্থে যে, সকল মানুষ ধর্ম, গোত্র ও ভৌগলিক-পরিচয় নির্বিশেষে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অতএব, তারা সকলেই ঐশী নির্দেশ লাভের সমান অধিকারী। অবশ্য, তেমন ঐশী নির্দেশ যদি তাদের কারো প্রতি, মানব সমাজের কোনও অংশের জন্য, কখনও দান করা হয়। এতে করে সত্যের উপরে কোন ধর্মের একচেটিয়া করণের যে ধারণা তা দূর হয়ে যাবে। সকল ধর্ম, তা সেগুলির নাম ও মতবাদ যাই হোক না কেন, সেগুলো যেখানেই পাওয়া যাক না কেন এবং যে যুগেরই হোক না কেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির কিছু না কিছু ঐশী সত্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। অধিকন্তু যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, মতবাদ এবং শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সব ধর্মই একটি অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। একই ঐশী কর্তৃত্ব বা অথরিটি, যা পৃথিবীর কোন এক এলাকার এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার এবং অন্যান্য যুগের মানুষদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেরও তত্ত্বাবধান করেছে। এবং,

এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের প্রবিত্র গ্রন্থ কোরআন করীমের বাণী।

নবুয়্যতের সার্বজনীনতা

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন যা বলে, তা হচ্ছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছিলাম (এই শিক্ষা সহ) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চলো" (১৬ঃ৩৭) ।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে যে, হে আল্লাহ্‌র নবী! তুমি পৃথিবীতে একমাত্র নবী নওঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۖ

"এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম যাদের মধ্য থেকে কারও কারও বিষয় তোমার নিকটে আমরা বর্ণনা করেছি, এবং তাদের মধ্য থেকে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকটে করিনি" (৪০ঃ৭৯) ।

পবিত্র কোরআন ইসলামের পবিত্র নবীকে (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ঃ

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ
أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

'তুমি কেবল একজন সতর্ককারী। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সর্তকারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকটে সতর্ককারী আগমন করেনি' (৩৫ঃ২৪,২৫) ।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলিতে এটা সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, ইসলাম অপরাপর ধর্মসমূহের উৎখাতসাধন দ্বারা সত্যের উপরে একচেটিয়া অধিকার দাবী করে না। বরং সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, খোদাতা'লা সকল যুগের এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছেন এবং সেই লক্ষ্যে তাঁর রসূলগণকেও প্রেরণ করেছেন, যাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতির কাছে - যাদের মধ্যে তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন– ঐশী বাণী প্রচার করে গেছেন।

সকল নবীই সমান

প্রশ্ন উঠে যে, যদি পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্‌র নবীদের আগমন হয়ে থাকে, তাহলে কি তাঁদের সকলের

ঐশী অথরিটি অভিন্ন? কোরআন শরীফের মতে সকল নবীরাই আল্লাহ্‌র। এবং সে কারণেই, ঐশী অথরিটির ব্যাপারে তাঁদের সকলেই সমভাবে সেই অথরিটি সমান তৎপরতা ও সমান শক্তিতে প্রয়োগ করে থাকেন। একজন নবীর সঙ্গে আর এক নবীর পার্থক্য সৃষ্টির কোন অধিকার কারো নেই। তাঁদের বাণীর প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই সমান। অন্যান্য ধর্ম এবং সেগুলির প্রবর্তকগণের প্রতি এবং সেই সঙ্গে ছোট ছোট নবীদেরও প্রতি ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক নবীর ওহী বা ঐশীবাণীর প্রামাণিকত্ব একই মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার যে নীতি তাকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে একটা অতি শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য ধর্মের নবীদের ঐশীবাণীর প্রতি যে বৈরিতার মনোভাব রয়েছে, তা সম্মান ও শ্রদ্ধার মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও, পবিত্র কোরআনের অবস্থান সুস্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্তঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ
بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن
رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ

'এই রসুল (ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা) স্বয়ং ঈমান রাখে তার উপরে যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে ,এবং অন্যান্য মুমেনরাও, তারা সকলেই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশ্‌তা এবং তাঁর কেতাবসমূহ ও তাঁর রসুলগণের উপরে ঈমান রাখে, (এবং তারা বলে) 'আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না, এবং তারা বলে 'আমরা শুনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম'-(২ঃ২৮৬)।

এই বিষয়টার কথা কোরআন মজীদের আরো অনেক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলগণকে অস্বীকার করে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি' এবং তারা চায় যেন তারা এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।

"তারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

"এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের উপরে ঈমান আনে এবং তাদের কারো মধ্যেই পার্থক্য করে না, তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে তিনি শীঘ্রই তাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়" (৪ঃ১৫১-১৫৩)।

প্রামাণিকত্ব (Authenticity) সমান হলে কি পদমর্যাদা ভিন্ন হতে পারে?

সকল নবীর প্রামাণিকত্ব সমান হলে কি তাঁদের পদমর্যাদাও সমান হবে? এই প্রশ্নের জবাব এটাই যে, বহুক্ষেত্রে নবীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে কীভাবে তাঁদের দায়িত্বাবলী পালন করেছেন সে ক্ষেত্রেও। আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁদের নৈকট্যের ব্যাপারে এবং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে যে পারস্পরিক মর্যাদা

তাঁরা লাভ করেছেন সে ব্যাপারে নবী ও রসূলদের কারো কারো সঙ্গে অপরের পার্থক্য রয়েছে। পবিত্র কোরআন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে নবীদের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা থেকেও প্রমাণিত হয় এই সিদ্ধান্ত।

কোরআন করীম স্বীকার করে যে, এই পদমর্যাদার পার্থক্যটা এরূপ যে, এতে মানুষের শান্তি নষ্ট হয় না। যে কোরআন শরীফ ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঐশী বাণী লাভের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে এক নবীর সঙ্গে অপর নবীর কোন পার্থক্য নেই, সেই কোরআন শরীফই ঘোষণা করছেঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

'এই রসূলগণ-যাদের মধ্য থেকে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি -তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ্ ব্যাক্যলাপ করেছেন, এবং তাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন' (২ঃ২৫৪)।

এই প্রস্তাবনা গৃহীত হওয়ার পরও, যে কেউ সবিস্ময়ে বলতে পারে যে, তাহলে নবীদের মধ্যে কে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী! এটা একটা স্পর্শকাতর ইস্যু; তবু এই প্রশ্নটা সম্পর্কে কেউ তার চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।

সকল ধর্মের অনুসারীরাই এই দাবী করে থাকে যে, তাদের ধর্মের প্রবর্তক অপরাপর সকল ধর্মের প্রবর্তকগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং চারিত্রিক উৎকর্ষে, মহত্বে, ধর্মপরায়ণতায়, সম্মানে -এক কথায় একজন নবীর জন্য অপরিহার্য সকল গুণাবলীতে-কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। তাহলে ইসলামও কি এই দাবী করে যে, ইসলামের পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন? হাঁ, ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে এই দাবী করে যে, হযরত রসুলে পাক (সাঃ) হচ্ছেন পৃথিবীর বাকী সকল নবীগণের মধ্যে সকল গুণাবলীতে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি, এই দাবীর ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে একটা অতি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমে, এটা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই নবুয়্যতের সার্বজনীনতা স্বীকার করে না। যখন ইহুদীরা দাবী করে (যদি তারা তা করেই) যে, মুসা (আঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তখন তারা মুসার সহিত কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও মুহাম্মদ (তাঁদের সকলের উপরে আল্লাহ্‌র শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক) এর তুলনা করে না। কারণ, তারা উল্লিখিত মহান ধর্ম-প্রবর্তকগণের কারো দাবীকেই সত্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে না। অতএব, নবীদের যে তালিকা ইহুদীরা দেয় তাতে পুরাতন নিয়মে (Old Testament) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত নবীদের নাম ছাড়া অপর কোন নবীর নাম নেই। এমন কি, অন্যত্র কোথাও নবী আগমনের সম্ভাবনাও সেখানে বাতিল করা হয়েছে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে, যে কোন ইহুদী-নবীর শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী তারা করে, তা ইসলামের দাবীর সমপর্যায়ে পড়ে না। কেননা ইহুদী ধর্মমতে, বাইবেলের বাইরে কোন নবী নেই। এক্ষেত্রে,বৌদ্ধধর্ম, যরাথুষ্ট্রের ধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতির দাবীও ঠিক একই প্রকারের।

তথাপি, একটা পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। যখন আমরা তাদের নবীদের কথা বলি, তখন আমরা এও জানি যে, তারা তাদের ধর্ম পুরুষদেরকে সব সময় নবী বলে উল্লেখ করে না। নবী ও রসুল সম্পর্কে যে ধারণা ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম দান করে তা অন্যান্য ধর্মগুলিতে নেই। বরং তারা তাদের ধর্মের প্রবর্তকদেরকে এবং ধর্মগুরুদেরকে মনে করে যে, তারা সবাই পবিত্র ব্যক্তিসত্তা, অথবা ঈশ্বরের অবতার, অথবা স্বয়ং ঈশ্বর,অথবা তদনুরূপ একটা কিছু। সম্ভবতঃ, এ ব্যাপারে, খৃষ্টান ধর্মের দিক থেকে যীশু খৃষ্টকেও ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করাই উচিত। কিন্তু ইসলামের মতে, তথাকথিত এই সকল ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, অথবা তথাকথিত ঈশ্বর পুত্র বা ঈশ্বর সন্তানরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী ও রসুল, যাঁদের উপরে পরবর্তীকালে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে তাদের অনুসারীরাই। বস্তুতঃ, আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, ইসলামের মতে, বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র পুরুষদের প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপের যে ব্যাপার তা ঘটেছে একটা ধীর প্রক্রিয়ায়, এটা নবী রসুলদের সমসাময়িক কোন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার ছিল না। কিন্তু, এ বিষয়ে, আমরা পরে আলোচনা করবো।

অবশ্য ইসলাম যখন এই দাবী করে যে, এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাই হচ্ছেন সকল নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন সে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের পবিত্র পুরুষদেরকেও ইহুদী ও ইসলামিক ধারণা মোতাবেক নবীরূপেই গণ্য করে। পুনরুক্তি হলেও বলতে হচ্ছে যে, ইসলাম সমস্ত ঐশী ধর্মের প্রবর্তকদেরকে স্রেফ মানুষরূপেই গণ্য করে যাঁদেরকে আল্লাহ্ নবুওয়্যতের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

এই সার্বজনীন ব্যাপারটাতে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ۝

'অতএব, তখন (তাদের) কেমন অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকেও এই সব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো' (৪ ঃ ৪২)।

এই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাটা দান করার পর, আমরা এখন কোরআন করীম অনুযায়ী ইসলামের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো। ইসলামের পবিত্র নবী সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দাবী পেশ করা হয়েছে কোরআন করীমের নিম্নোক্ত বহুবিদিত এবং ব্যাপক আলোচিত আয়াতেঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ۝

'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহ্র রসুল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।' (৩৩ঃ৪১)।

এই আয়াতের 'খাতাম'শব্দটির বহু গূঢ় অর্থ রয়েছে, কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, 'খাতামান নবীঈন' উপাধির মর্ম হচ্ছেঃ সর্বোত্তম; সর্বশ্রেষ্ঠ; শেষ কথা; ছুড়ান্ত অথরিটি; সবাইকে পরিবেষ্টণকারী; অন্য সকলের সত্যতার তসদীক বা সত্যায়ণকারী। (আরবী ভাষার সকল অভিধান পি,ডব্লিউ লেন; আকরাব আল মুওয়ারিদ; ইমাম রাগিবের মুফ্‌রাদাত; ফাত্‌হ্‌ ও যুরকানী)।

অন্য একটি আয়াত, যাতে ইসলামের পবিত্র নবীর চরম উৎকর্ষের কথা বলা আছে, তাতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষাই বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত। আয়াতটি হচ্ছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (ধর্মকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করলাম।' (৫ঃ৪)।

এই দাবী থেকে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, পৃথিবীর সকল শরীয়তবাহী নবীদের মধ্যে এবং পৃথিবীকে সব চাইতে পূর্ণ ও বিশুদ্ধ শিক্ষা দান করার ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) সকল নবীরসুলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এই মর্মকথাকে আরো জোরদার করে রসুলে পাক (সাঃ)-কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, যে কিতাব তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা সর্বদা রক্ষা করা হবে এবং তাকে সর্ব প্রকারের প্রক্ষেপ থেকেও মুক্ত রাখা হবে। সুতরাং, এই শিক্ষাকে শুধু যে পারফেক্ট বা সম্পুর্ণ বলেই দাবী করা হয়েছে তা নয়, বরং সেই সঙ্গে এই ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে যে, এই কিতাব চিরস্থায়ী হবে, একে বিশুদ্ধ রাখা হবে, এর প্রতিটি শব্দকে ঠিক তেমনি হুবহু রাখা হবে যেভাবে সেগুলি অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইসলামের প্রবর্তক রসুলে পাক (সাঃ)-এর উপরে। এই সত্যের প্রামাণ্য সাক্ষ্য বহন করছে বিগত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাস।

এক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক কিছু আয়াত হচ্ছেঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

'নিশ্চয় আমরাই অবতীর্ণ করেছি এই যিকর্ (কোরআন) এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী।' (১৫ঃ১০)।

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

'নিশ্চয়ই, এ অতি গৌরবময় কোরআন, যা রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে।' (৮৫ঃ ২২, ২৩)।

উল্লিখিত আয়াতগুলির আলোকে সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় যে, ইসলামের পবিত্র প্রবর্তক শুধু নিশ্চিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ও সর্বশেষ শরীয়ত আনয়নকারী নবী। এবং তাঁর (সাঃ) সেই অথরিটি বা কতৃত্ব বলবৎ থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

এই কথা বলাতে কেউ হযতো ভাবতে পারেন যে, ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের চরম শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এই দাবীটা কি অন্যসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাবের এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করবে না! তাহলে, ইসলামের যে দাবী, ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শান্তির গ্যারান্টি দান করে, তার সঙ্গে উক্ত দাবীর তাৎপর্যের সঙ্গতি কোথায়?

এই প্রশ্নটার কথা মনে রেখেই এই দাবীটার ব্যাপারে আমাকে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। এই প্রশ্নটার উত্তর পক্ষপাতমুক্ত ও অনুসন্ধানী মনের সন্তুষ্টির জন্য একাধিকভাবে দেওয়া যায়। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য অনেক ধর্মের অনুসারীরাও অনুরূপ দাবী করে থাকে। তবে, এতে উত্তেজিত না হয়ে প্রত্যেকের জন্য উচিত হবে যে, পরস্পরের এইরূপ দাবীর গুণাগুণ নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা,বিচার বিবেচনা করে দেখা। কারো শুধু দাবী-ই যেন অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কারণ না হয়। কেননা, অনুরূপ দাবী তো তারা সবাই করে থাকেন।

কিন্তু, ইসলাম এক্ষেত্রে আরো একধাপ অগ্রসর হয় এবং তার অনুসারীদেরকে বিনয় ও শালীনতার শিক্ষা দেয়, যাতে করে রসুলে পাক (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের যে বিশ্বাস তা প্রকাশ করতে গিয়ে তারা যেন অসতর্কতার কারণে অন্যদের মনে আঘাত না দেয়।

ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের (সাঃ) নিম্নোক্ত বাণী (হাদীস) দু'টি আলোকবর্তিকারূপে এই বিষয়টির উপরে পর্যাপ্ত আলোকপাত করছেঃ

(১) একদা হযরত রসুলে পাক (সাঃ)-এর একজন সাহাবী (সঙ্গী), হযরত ইউনুস (আঃ) যাঁকে একটা বিরাট মাছ (তিনি) গিলে ফেলেছিল, তাঁর একজন গোঁড়া ভক্তের সঙ্গে এক উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়। বিতর্কে উভয় পক্ষই এই দাবী করছিলেন যে, তাঁর নবীই হচ্ছেন গুণে গরিমায় অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান ব্যক্তিটি (অর্থাৎ সেই সাহাবী - রাঃ) মনে হয়, এমন ভাবে খোঁটা দিয়ে কথা বলছিলেন যে, তাতে ইউনুস নবীর (আঃ) সেই ভক্ত অনুসারী দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন মনে। তিনি মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষ ঐ সাহাবীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। তখন, রসুলে পাক (সাঃ) সাধারণভাবে সবাইকে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দিলেন, তা হচ্ছেঃ

لا تفضلونى على يونس بن متى

'তোমরা আমাকে মাত্তার পুত্র ইউনুসের চাইতে বড় বলে (এভাবে) প্রচার করো না।' (বুখারী)।

হাদীসের অনেক মুসলিম ভাষ্যকার এই হাদীসটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। কেননা, দৃশ্যতঃ, এই হাদীসটি পবিত্র কোরআনের সেই দাবীটির বিরোধী, যাতে রসুলে করীম (সাঃ) কে শুধু ইউনুস নবীরই (আঃ) নয়, বরং সকল নবী রসুলের (আঃ) চাইতে বড় বলা হয়েছে। কিন্তু, সম্ভবতঃ তারা এই বিষয়টা লক্ষ্য করেন না যে, তিনি (সাঃ) যা বলেছিলেন তার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি ইউনুস (আঃ)-এর চাইতে ছোট ছিলেন কিংবা তাঁর চাইতে বড় ছিলেন; বরং তার অর্থ এই ছিল যে, তাঁর (সাঃ) অনুসারীদের এটা উচিত নয় যে, তারা তাঁর বড় হওয়ার বিষয়টাকে এমনভাবে প্রকাশ করে যে, যাতে অন্যান্যদের মনে আঘাত লাগে।

এই প্রসঙ্গে, যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা যায়, তা হচ্ছে নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শিষ্টাচারের একটা সবক দিতে চেয়েছিলেন। তাদের তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তারা যেন দম্ভ বা অহমিকায় পতিত না হয়। তারা যেন তাঁর (সাঃ) মর্যাদা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা না করে যাতে অন্যান্যরা মনে আঘাত পায়। অন্যথায়, অনুরূপ মনোভাব ইসলামের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। কেননা, তাতে ইসলামের নবীর জন্য মানুষের মন ও হৃদয়কে তো জয় করা যাবেই না, বরং তাতে উল্টোটাই ঘটবে।

(২) হযরত রসুলে পাক (সাঃ)-এর এই মনোভঙ্গীর সমর্থন মিলে অপর একটি হাদীসে। উল্লিখিত বিতর্কের মতই এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন একজন মুসলমান একজন ইহুদীর সঙ্গে। উভয়েই এই দাবী ও পাল্টা দাবী করছিলেন যে, তার ধর্ম গুরুরাই অপরের ধর্মগুরুদের চাইতে বড়। এক্ষেত্রেও, অমুসলিম লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করলো। রসুলে পাক (সাঃ) তাঁর অভ্যাসমত বিনয় ও প্রজ্ঞা প্রদর্শন করলেন এবং মুসলমানদেরকে শালীনতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে বললেনঃ

لا تفضلوني على موسى

'আমাকে মুসার চাইতে বড় বলে ঘোষণা কর না' (বুখারী)।

মোদ্দা কথা, খোদাতা'লার সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে নবীদের মধ্যে কে কতটা মর্যাদার অধিকারী তা কেবল খোদাই নির্ধারণ করতে পারেন এবং তিনিই কেবল তা ঘোষণা করতে পারেন। এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, বিশেষ যুগের বিশেষ কোন ধর্মের প্রেক্ষিতে সেই যুগের নবী সম্পর্কে খোদাতা'লা তাঁর সন্তোষ এমন ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন যাতে মনে হবে যে, সেই নবীই হচ্ছেন সেই যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর যাই হোক, এটাও ঠিক যে, স্থান ও কালের সীমার প্রেক্ষাপটে তুলনার ক্ষেত্রে চরমত্ব প্রকাশক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। এবং এই ব্যাপারটাই যে কোন পবিত্র পুরুষের অনুসারীদেরকে এই ধারণায় উপনীত করে যে, তাদের সেই ধর্ম গুরুই হচ্ছেন সকল যুগের, এবং অনাগত সকল সময়েরও, সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ব্যক্তি। এই বিষয়টার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রাখাটাই অন্যের প্রতি আঘাত বলে মনে করা উচিৎ নয়। একটা সভ্য দৃষ্টি ভংগীর জন্য যা

প্রয়োজন তা হচ্ছে, এই বিষয়গুলোকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কলহ-কোন্দল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা। এবং এটাই ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে, রসুলে পাক (সাঃ)-এর উপরোক্ত নির্দেশবাণীর মর্মকথা। যদি বিনয়ের এবং শিষ্টাচার-শালীনতার এই নীতিকে সকল ধর্মই মান্য করে চলে, তাহলে ধর্মীয় বাদানুবাদের দুনিয়াটায় একটা শুভ পরিবর্তন সূচিত হবে।

'পরিত্রাণ' কোন ধর্মের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না

পরিত্রাণের প্রশ্নটা, আপাতঃ দৃষ্টিতে যত সাদামাটাই মনে হোক না কেন, তা ধর্মীয় জগতে শান্তি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

একটি ধর্মের পক্ষে এই ঘোষণা দেওয়াটা এক জিনিষ্ যে, যদি কেউ শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে চায় এবং নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, তবে তাকে সেই ধর্মেরই নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে হবেঃ এখানেই সে পরিত্রাণ লাভ করবে। কিন্তু সেই ধর্মের পক্ষে একই সঙ্গে এই ঘোষণাটা দেওয়া সম্পুর্ণ আলাদা জিনিষ যে, যারা সেই ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করবে না, তারা সকলেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে; তারা খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা-ই করুক না কেন, তারা তাদের স্রষ্টাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে যত বেশী ভালবাসুক না কেন, তারা যত বেশী পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণ জীবণ যাপন করুক না কেন, তারা নিশ্চিতভাবে চিরস্থায়ী এক জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

যখন এই ধরনের একটা কট্টর, সংকীর্ণমনা এবং অসহিষ্ণু মতাদর্শের কথা উত্তেজনাকর ভাষায় প্রকাশ করা হয়, বিশেষতঃ, ধর্মীয় 'জিলোট' বা গোঁড়া ধর্মান্ধদের দ্বারা, তখন, এটা জানা কথাই যে, তাথেকে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

সাধারণ মানুষ নানা ধরনের হয়ে থাকে। কেউবা শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, এবং সভ্য; এরা এদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আঘাত বা অপরাধের প্রতিক্রিয়া এদের অবস্থান অনুসারেই দেখিয়ে থাকে। কিন্তু, ধর্মের প্রতি অনুরাগ পোষণকারী জনসাধারণের একটা বিরাট সংখ্যক অংশ তারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যা-ই হোক না কেন যখন তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তখন তারা মারমুখী হয়ে উঠে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ধর্মগুরু বা যাজক পুরোহিত প্রভৃতি ব্যক্তিদের মনোভঙ্গী তাদের সম্পর্কে যারা তাঁদের বিশ্বাসকে মেনে নিতে রাজি নয়। । এমনকি, ইসলামকেও, মধ্যযুগীয় (ভাবধারার) আলেমরা পেশ করছে পরিত্রাণের একমাত্র পথ বলে, এবং এই ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পরে, যে সকল আদম সন্তান ইসলামের গন্ডীর বাইরে থেকে মারা গেছে তারা কেউ পরিত্রান পাবে না। খৃষ্টধর্মও এথেকে ভিন্ন কিছু বলে না, অন্য কোন ও ধর্মও না, অন্ততঃ আমার জানা মতে।

কিন্তু আমি আমার শ্রোতৃবর্গকে এই নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, ইসলামের প্রতি এইরূপ একটা গোঁড়া এবং সংকীর্ণ মতাদর্শ আরোপের কোন সমর্থন নেই ইসলামে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে।

কোরআন করীমের মতে, পৃথিবীতে এমন কোন বিশেষ ধর্ম নেই, যা কিনা পবিত্রাণের উপরে তার একচেটিয়া অধিকার রাখে। যদি নতুন কোন সত্যও অবতীর্ণ হয়, এবং আলোকের নবযুগ সূচিত হয়, আর তা যারা জানতে পারবে না, এবং এই না জানাটার জন্য যদি তাদের নিজেদের কোন দোষ না থাকে, তাহলে তারা এবং যারা কোনও ভ্রান্ত আদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েও সাধারণভাবে সত্য ও সৎ জীবন যাপন করার চেষ্টা করে থাকে, তাদেরকেও আল্লাহ্ পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা হয়েছে, কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতেঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝

'আমরা প্রত্যেক উম্মতের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, তদনুসারে তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাদেরকে তোমার প্রভু প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপরে আছ।' (২২ ঃ ৬৮)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ
مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মদ-সাঃ-এর উপরে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে তারা এবং সাবীরা এবং খৃষ্টানরা-যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকাজ করে, না তাদের কোন ভয় থাকবে, এবং না তারা দুঃখিত হবে।' (৫ঃ৭০)।

আমি আপনাদেরকে স্মরণ করায়ে দিতে চাই যে, 'আহলে কিতাব' কথাটি যদিও সাধারণতঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবু, তাৎপর্যের দিক থেকে কথাটি ব্যাপাকতর অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। কোরআনের যে দাবীঃ 'দুনিয়াতে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আমরা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি'-সেই দাবীর এবং অন্যান্য আয়াতের (উপরে উদ্ধৃত) পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতিগুলি মাত্র 'পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচার' (তৌরাত ও ইঞ্জিল) কিতাবে উল্লেখিত জাতিগুলিই নয়, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল বরং এটা নিশ্চিত যে, মানবজাতির মঙ্গলার্থে অন্যান্য কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং যে সকল ধর্ম এই দাবী রাখে যে, সেগুলি প্রবর্তিত হয়েছে ঐশী বাণীর ভিত্তিতে, সেগুলিকে 'আহলে কিতাবের' অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে।

এছাড়া, কোরআন পাকে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'সাবী'-যদ্বারা এ বিষয়টি থেকে সকল সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে। 'সাবী' শব্দটি আরবরা সেই সকল অনারব এবং অসেমেটিক ধর্মগুলির জন্য ব্যবহার করতো যাদের নিজেদের ঐশী ধর্মগ্রন্থ ছিল। সুতরাং ঐশীবাণীর ভিত্তিতে প্রবর্তিত ধর্মসমূহের অনুসারীদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, যদি তারা নবাগত ধর্মের আলো চিনতে সত্যিসত্যিই অপারগ হয়, এবং সততার সঙ্গে ও সঠিকভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের মূল্যবোধসমূহকে পালন করে, তাহলে খোদাতা'লার

তরফ থেকে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা পরিত্রাণ থেকেও বঞ্চিত থাকবে না।

পবিত্র কোরআন মুমিনদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তা তারা ইহুদী, খৃষ্টান বা সাবী যে দলেরই হোক না কেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা হচ্ছেঃ

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকটে (যথাযোগ্য) পুরস্কার; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ঃ ৬৩)।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

এবং যদি তারা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাদের প্রভুর নিকট থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতো, তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের উর্ধদেশ থেকেও এবং তলদেশ থেকেও (নেয়ামত সমূহ) ভোগ করতো। অবশ্য, তাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক যে কাজকর্ম করছে তা অতিশয় মন্দ। (৫ঃ৬৭)।

যারা ইসলামের গন্ডীভুক্ত নয় তাদের সবাইকে নির্বিচারে নিন্দা ভর্ৎসনা করার বিরুদ্ধে মুসলমানদের পবিত্র কোরআন নির্দেশ দেয়ঃ

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

'তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন অনেক দলও আছে যারা (তাদের অঙ্গীকারে) কায়েম আছে, তারা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তারা (তাঁর সম্মুখে) সিজদা করে। তারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অন্যায় অসঙ্গত কাজে বারণ করে, এবং সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ, এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা যে কোন সৎকাজই করুক না কেন, তাদেরকে তাঁর প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।' (৩ঃ১১৪-১১৬)।

সাম্প্রতিককালে, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যেকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে একটা বিরাট ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা হচ্ছে ইসলামের মতে ইহুদীরা সবাই জাহান্নামী। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা তা আমি প্রমাণ করেছি কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতগুলির মাধ্যমে। এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকেও তা প্রমাণিত হয়ঃ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝

'এবং মুসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা সত্যের সাহায্যে হেদায়াত পাচ্ছে এবং তার সাহায্যে ন্যায় বিচার করছে।' (৭ঃ১৬০)।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি সাধন

পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেবল মুসলমানরাই যে অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের প্রতি উপদেশ দিচ্ছে এবং সুবিচার করছে তা নয়, বরং এমন আরও অনেক জাতি আছে যারা অনুরূপ কাজ করছে।

এই দৃষ্টিভংগীটাকে আজ পৃথিবীর সকল ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে অপরাপর ধর্মবিশ্বসগুলোর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী জাতিরগুলোর প্রতি অনুরূপ উদার মনোভাব, মহানুভবতা এবং মানসিক সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে না পারলে ধর্মীয় শান্তি কোনক্রমেই অর্জিত হবে না।

পবিত্র কোরআন, সাধারণভাবে, দুনিয়ার সকল ধর্ম সম্পর্কেই একথা বলেঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۝

'এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একটা দল আছে যারা (লোকদেরকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং তদ্বারা ন্যায় বিচার করে' (৭ঃ১৮২)।

সার্বজনীনতার ধারণা

স্মরণাতীত কাল থেকেই বহু দার্শনিক এমন একটা সময়ের স্বপ্ন দেখে আসছেন, যখন সমগ্র মানবজাতি একই পরিবার হিসেবে একই পতাকার তলে সমবেত হবে। মানবজাতিকে একীভূত করার এই ধারণা বা কনসেপ্ট শুধু যে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের দ্বারাই সমর্থিত বা গৃহীত হয়েছে তা নয়, বরং এই ধারণাটি একইভাবে অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারাও সমর্থিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাটির প্রতি ধর্ম জগতে যত বেশী গুরুত্ব সহকারে জোর দেওয়া হয় ততটা জোর আর কোথাও দেওয়া হয় না।

ইসলাম যদিও, বাহ্যতঃ, সাধারণ অর্থে, অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে (যেগুলির কোন কোনটা বিশ্বকে শাসন করার অতি উচ্চ অভিলাষ রাখে) এ ব্যাপারে অভিন্ন অভিমতই পোষণ করে, তথাপি ইসলামের অবস্থান তার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ঐ সকল উচ্চাভিলাষী দাবী থেকে সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র। এই বিতর্কিত বিষয়টি বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তাছাড়া, এক্ষেত্রে এই বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ারও অবকাশ নেই যে, সমগ্র মানবজাতিকে একই ঐশী পতাকার তলে সমবেত করার

জন্যে আসলে কোন ধর্মকে আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমতা দান করা হয়েছে। যদি দুটো, তিনটে বা চারটে শক্তিশালী ধর্ম, যেগুলির প্রত্যেকটির দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে, একইসঙ্গে সার্বজনীন ধর্ম হওয়ার দাবী করে, তাহলে কি তা সকল মানুষের মনের মধ্যে একটা বাজে বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার জন্ম দিবে না? বিশ্ব শাসনের জন্য তাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংগ্রাম কি তখন বিশ্ব শান্তির জন্য একটা সত্যিকারের দারুণ হুমকী স্বরূপ দেখা দিবে না?

ধর্মগুলোর পক্ষে বিশ্বজোড়া এই জাতীয় আন্দোলনগুলো নিজেদের জন্যই দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে এই বিপদও দেখা দিচ্ছে যে, ঐ আন্দোলনগুলো চলে যাচ্ছে এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন, ধর্মান্ধ এবং অসহিষ্ণু নেতৃত্বের হাতে। যার অর্থ হচ্ছে, এ ব্যাপারে যেসব ঝুঁকির আশংকা আছে; তা বহু গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা শুধু একাডেমিক বা আলোচনার পর্যায়ে না থেকে সত্যি সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলনরূপে দেখা দিচ্ছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, একটা অপপ্রচার চালানো হয় যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানেই বল প্রয়োগ করে থাকে। এই ধরনের কথা শুধু যে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরাই বলে থাকে তা না, বরং তা মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন মুসলিম উলেমার কাছ থেকেও শোনা যায়।

যদি কোন ধর্ম আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে অপরাপর ধর্মগুলিরও এই অধিকার জন্মাবে যে, তারাও সেক্ষেত্রে, একই অস্ত্রে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

অবশ্য, আমি এ ব্যাপারে একমত নই এবং আমি তা জোরের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করি যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করার পক্ষপাতি। তবে, বিষয়টা নিয়ে আমি পরে আলোচনায় ফিরে আসবো।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই যে, পৃথিবীর কোনো ধর্মের এই ধরনের দাবীর পিছনে কোন যৌক্তিকতা আছে কি না। কোনও একটি ধর্ম - তা সে ইসলাম, খৃষ্টধর্ম অথবা অন্য যে ধর্মের কথাই আপনি বলুন না কেন, তা কি তার বাণীর

ক্ষেত্রে সার্বজনীন হতে পারে? যে সার্বজনীনতার অর্থ এই যে, তার বাণী বর্ণ গোত্র জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য? তাহলে, সেক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয়, উপ-জাতীয়, জাতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং সাংস্কৃতিক ধারা ও কর্মকান্ডের অধিকারী লোকদের অবস্থা কি হবে?

ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বজনীনতার ধারণাটা এমন হওয়া চাই যে, তা শুধু ভৌগলিক ও জাতীয় সীমারেখাকেই অতিক্রম করবে না, তাকে সময় বা কালের সীমাকেও অতিক্রম করতে হবে। তাহলে, যে প্রশ্নটা দেখা দিবে, তা হচ্ছেঃ কোনো ধর্ম কি চিরন্তন হতে পারে? অর্থাৎ কোনো ধর্মের শিক্ষা কি সমান কার্যাকারিতা নিয়ে এই যুগের মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে, এবং হাজার বছর পূর্বের কিংবা হাজার বছর পরের মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে? এমনকি, যদি কোনও একটা ধর্মকে পৃথিবীর গোটা মানবজাতিটাই গ্রহণ করে নেয়ও, তাহলেও প্রশ্ন উঠবে যে, কি করে সেই ধর্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে?

এক্ষেত্রে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য হবে, উল্লিখিত সমস্যাবলীর সমাধান কীভাবে সম্ভব, তা তাদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষানুযায়ী উপস্থাপন করা। যাহোক, আমি ইসলামের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলোর যে ইসলামী উত্তর তা অতি সংক্ষেপে পেশ করতে চাই।

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম

পবিত্র কোরআন বার বার এ বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার শিক্ষা মানুষের মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম জোর দিয়ে বলে যে, মানবমন বা মানবাত্মার মধ্যে প্রোথিত যে ধর্মের মূল তা স্থান ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। মানবাত্মা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং যে ধর্মের মূল প্রকৃতই মানবাত্মার অভ্যন্তরে প্রোথিত, তা অপরিবর্তনশীল। অবশ্য, যদি তা মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থাদির মধ্যে খুব বেশী জড়িয়ে না পড়ে, তা সে যে কোন যুগই হোক, আর মানুষ যত বেশী প্রগতিই সাধন করুক। যদি কোন ধর্ম,

সেই সমস্ত নীতির উপরে অটল থাকে, যা মানবাত্মা থেকে স্বতঃ উৎসারিত,তবে সেই ধর্মের পক্ষে একটি সার্বজনীন ধর্মরূপে পরিণতি লাভ করার যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলাম আরও একধাপ অগ্রসর। ইসলাম তার অনন্য অনুধ্যায়ী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এই মত পোষণ করে যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু না কিছু সার্বজনীনতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং, প্রতিটি অবতীর্ণ ঐশী ধর্মে শিক্ষার এমন একটা কেন্দ্রীয় মর্ম পাওয়া যায়, যা কিনা মানবাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা চিরন্তন সত্য। ধর্মগুলোর এই যে মর্ম,তা অপরিবর্তিত থাকে, যদি না কোন ধর্মের অনুসারীরা পরবর্তীকালে সেই ধর্মের শিক্ষাকে কলুষিত করে ফেলে।

এই বিষয়টা সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতেঃ

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝

'এবং তাদেরকে (আহলে কিতাব) এ ছাড়া আদেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই এবাদত করবে, ধর্মকে তারই জন্য বিশুদ্ধ করে একনিষ্ঠভাবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে এবং এটাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম।" (৯৮ঃ৬)

فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ۝

'অতএব, তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যার উপরে তিনি মানবকে

সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই চিরস্থায়ী ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়'। (৩০ঃ৩১)।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে, একই শিক্ষাসহ একের পর এক ধর্ম পাঠাবার যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া,যে কেউ এই প্রশ্নও তুলতে পারেন যে, যদি সকল ধর্মের শিক্ষাই অপরিবর্তণীয় এবং সার্বজনীন হয়, এবং তা সকল যুগের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য হয, তাহলে ইসলাম কেন এই দাবী করে যে, পূববর্তী সকল ধর্মের তুলনায় তার শিক্ষাই অধিকতর সার্বজনীন এবং বিশুদ্ধ?

(১) প্রথম প্রশ্নটির জবাবে পবিত্র কোরআন মানুষের দৃষ্টি এই অবিসংবাদিত সত্যের প্রতি আকর্ষণ করে যে, কোরআনের পুর্বে যে সকল ' কিতাব ও ধর্মপুস্তকাদি (সহিফা) অবতীর্ণ হয়েছিল তা সবই মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়ে গেছে। সেই সকল ধর্ম গ্রন্থাদির শিক্ষাসমূহ ক্রমাগতভাবে সংশোধনীর দ্বারা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। অথবা সেগুলির মধ্যে নতুন নতুন বিষয় প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে, ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপুস্তকের বৈধতা এবং প্রামানিকতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং তা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

সুতরাং, কোন ধর্মগ্রন্থে কোন পরিবর্তন সাধন করা না হয়ে থাকলে, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাবে সেই ধর্মের অনুসারীদের স্কন্ধেই। এ ব্যাপারে, কোরআনের অবস্থান অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপুস্তকাদির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অনন্য। এমনকি ইসলামের অনেক কট্টর দুষমন, যারা বিশ্বাসই করে না যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম (কথা), তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন, সন্দেহাতীতরূপে, ঠিক তেমনই হুবহু এবং অবিকৃত রয়ে গেছে যেমন তা দাবী করা হয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌র কালাম বলে। যেমন, স্যার উইলিয়াম মুইর তার Life of Mohamet, (London, 1878), পুস্তকে লিখেছেনঃ There is otherwise every security , internal and external, that we posses the text which Mohamet himself gave forth and used (p.xxvii)

We may, upon the strongest assumption, affirm that every verse in the Quran is the genuine and unaltered composition of Mohamet himself. (p. xxviii) [Life of Mohamet by Sir William Muir (London, 1878)].

Slight clerical errors there may have been, but the Quran of Uthman contains none but genuine elements, though sometimes in very strange order. The efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Quran have failed. (Prof. Noldeke in Encyclopaedia Brittanica; 9th edition, under Quran).

'মুহাম্মদ নিজে যা দিয়ে গেছেন এবং ব্যবহার করে গেছেন, (কোরআনের) সেই টেক্সট (পাঠ), যা এখন আমাদের কাছে আছে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, সব্যপ্রকারের নিরাপত্তাই অক্ষুন্ন রয়েছে।' (পৃ ২৭)

'আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই সমর্থন দিতে পারি যে, কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত মুহাম্মদের নিজের খাঁটি ও অবিকৃত রচনা।' (পৃ ২৮)

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে (নবম সংস্করণ), বলা হয়েছেঃ 'অতি সামান্য করনিক (ক্লারিক্যাল) ত্রুটি বিচ্যুতি হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু ওসমানের (সংগৃহীত) কোরআনে তেমন কিছুও নেই, আছে শুধু খাঁটি অংশগুলোই, যদিও কখনও কখনও তার বিন্যাস খুবই অস্বাভাবিক। ইয়োরোপীয় পন্ডিতদের, কোরআনের মধ্যে পরবর্তী কোন প্রক্ষেপের অস্তিত্ব প্রমাণের,তাবৎ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।' (প্রফেসর নলডিকিঃ কোরআন)।

বিতর্কের এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এলাকা যে, কোন কিতাব কার দ্বারা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সেই একই কিতাব যার খোদাতা'লা কর্তৃক প্রণীত হওয়াকে সব আহলে কিতাবই চ্যালেঞ্জ করে থাকে, তা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে যে, শুধু তৌরাত ও ইঞ্জিলই (পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচারসমূহ) খোদা কর্তৃক আংশিকভাবে প্রণীত নয়, বরং পৃথিবীর অন্যসব এলাকার অন্যসব ধর্মের অন্যসব

কেতাবগুলিও, প্রশ্নাতীতভাবে, তদ্রূপ একই খোদা কর্তৃক প্রণীত। যে সমস্ত পরস্পর বিরোধিতা আজকের দিনে, সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তা সবই মানুষের সৃষ্ট। বলা প্রয়োজন যে, পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গী এ ব্যাপারে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং তা সকল ধর্মের মধ্যে শান্তি স্থাপনে কার্যকরভাবে সহায়ক।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রসঙ্গে, পবিত্র কোরআন মানব সমাজের প্রতিটি পর্যায়ের বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন ধর্মের প্রয়োজন শুধু একজন্যই হয়নি যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মৌলিক শিক্ষা, যা কিনা মানুষের হস্তক্ষেপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল - তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল, বরং সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন নতুন শিক্ষা দানেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল প্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য।

(৩) এটাই সবকিছু নয়। আর একটা উপদান এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকে, এবং তা হচ্ছে- সময় সম্পৃক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা, যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল শুধু বিশেষ কোন সময়ের বা মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা মিটাবার উদ্দেশ্যে। এর অর্থ হচ্ছে– ধর্মগুলি শুধু যে অপরিবর্তনশীল নীতিসমূহের কেন্দ্রিয় মর্ম দিয়েই গঠিত, তা নয়। বরং, সেই সঙ্গে সেগুলি এক প্রকার লেবাসী, গৌণ ও পরিবর্তনশীল শিক্ষা দ্বারাও সজ্জিত।

(৪) সবশেষে বলা দরকার যে, মানুষকে একচোটেই ঐশী শিক্ষায় এবং প্রশিক্ষণে শিক্ষিত ও সুদক্ষ করে তোলা হয়নি। বরং তাকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে মনন-চিন্তনে পরিণত করে তোলা হয়েছে, যে পর্যায়ে তাকে তার হেদায়াতের (সৎপথে পরিচালিত হওয়ার) জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য ও সমর্থ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কোরআনের দাবী মতে, চিরস্থায়ী মৌলিক নীতিসমূহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটা গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়েছে চূড়ান্ত, পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম শিক্ষা অর্থাৎ ইসলামেরই একটা অংশরূপেই। যে বিষয়গুলো ছিল স্রেফ স্থানীয় এবং সাময়িক সেগুলো রহিত করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকী যা সব, অতঃপর, সদা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে, তা সবই রেখে দেওয়া হয়েছে, রক্ষা করা হয়েছে। - (দ্রঃ ৫ঃ১৪-১৬)।

এটাই হচ্ছে, আসলে ধর্মীয় সার্বজনীনতার ইসলামিক ধারণা বা কনসেপ্ট। এবং ইসলামের দাবীও এটাই। এখন এটা মানুষেরই দায়িত্ব যে, সে বিভিন্ন দাবীকারকের তুলনামূলক গুণাগুণের অনুসন্ধান করবে, বিচার করবে।

এখন, আবারও একবার আমরা সেই সকল ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই, যেগুলো নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে বিশ্ব-প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে। স্পষ্টতঃই, ইসলাম এইরূপ উচ্চাভিলাষকে সমর্থন করে। পবিত্র কোরআন, ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে ঘোষণা করে যে, ইসলাম একদিন মানবজাতির একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۝

'তিনিই তাঁর রসুলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত করে দেন, মুশরেকরা যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন।' (৬১ঃ১০)।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি সৃষ্টির অঙ্গীকার সত্ত্বেও, ইসলাম অন্যান্যদের উপরে প্রাধান্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণী ও আদর্শের প্রতিযোগিতামূলক বিস্তারকে নিরুৎসাহিত করে না। বস্তুতঃ, এরই মাধ্যমে একিটি মহৎ লক্ষ্য হিসেবে অন্যান্য সব ধর্মের উপরে ইসলামের চূড়ান্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এবং এজন্যই ইসলামের অনুসারীদের উচিত ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোরআন করীম বলেঃ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ

وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

"তুমি বল 'হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসুল যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর এই রসুল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ এবং তার বাণীসমূহের উপর এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।" (৭ঃ১৫৯)।

যাহোক, পরস্পর সংঘাত ও ভুল বুঝাবুঝি অবসানের লক্ষ্যে, ইসলাম (মানুষের) আচরণেরও একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দান করেছে। যার ফলে, সবার জন্য ন্যায্য ব্যবহার, নিরংকুশ সুবিচার, বাক্-স্বাধীনতা, প্রকাশের অধিকার এবং ভিন্নমত পোষণের অধিকার নিশ্চিত হতে পারে।

সংগ্রামের উপকরণ, বাধ্যবাধকতা নেই

সংঘাত-সংঘর্ষ না ঘটিয়েও একটা ধর্ম কী করে দাবী করতে পারে যে, তা সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন?

সার্বজনীন বাণী এবং একই পতাকার তলে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করবার বিশ্বজনীন উচ্চাভিলাষ নিয়ে কোন ধর্মই ক্ষণিকের জন্যেও এই ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, সে তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করবে।

'তরবারি ভুখন্ড দখল করতে পারে, কিন্তু হৃদয় নয়'

'বল মাথা নত করাতে পারে, কিন্তু মন নয়।'

ইসলাম তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। ইসলাম ঘোষণা করেঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ

'ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ নেই, কারণ সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ...।' (২ঃ২৫৭)।

সুতরাং, জবরদস্তির কোনও প্রয়োজন নেই। এটা মানুষের কাছেই ছেড়ে দাও, তারাই ফয়সালা করুক, সত্য কোথায়। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তা'লা পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি যেন সমাজের সংস্কার সাধন করতে গিয়ে বল প্রয়োগের কোন ধারণাই মনে স্থান না দেন। সংস্কারক হিসেবে তাঁর (সাঃ) অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝

"সুতরাং, তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের জন্য জিম্মাদার নও।" -(৮৮ঃ২২,২৩)

এই বিষয়টার উপর আরও জোর দেওয়ার জন্যে হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছেঃ

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ

"কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে আমরা তোমাকে তাদের উপরে হেফাযতকারী করে পাঠাইনি। কেবল (সংবাদ) পৌঁছিয়ে দেওয়াই তোমার কর্তব্য।" (৪২ঃ৪৯)

এমনকি , নতুন আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে যদি সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং তাতে উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহলে, সেক্ষেত্রে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ধৈর্য প্রদর্শন করবার, ঐকান্তিকতা অবলম্বন করবার এবং যথা-সম্ভব সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবার নির্দেশ দেয়। এজন্য, যখনই মুসলমানকে সারা বিশ্বে ইসলামের বাণী প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখনই তার জন্যে একটা পরিষ্কার আচরণ বিধিও দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোরআন শরীফে বহু আয়াত আছে। তন্মধ্যে, আমরা কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে বিষয়টাকে পরিষ্কার করার জন্যেঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن

ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۝

'তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।' (১৬ঃ১২৬)।

এবং ادْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

'তুমি মন্দকে তার দ্বারা প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, তারা যা বর্ণনা করে আমরা তা ভালভাবেই জানি।' (২৩ঃ৯৭)। এখানে 'আহ্সান' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং সুন্দর।

যে আচরণ বিধির আওতায় মুমিনরা অবিশ্বাসীদের কাছে এই বাণী পৌঁছায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআন নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেঃ

وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝

'কসম মহাকালের। নিশ্চয় ইনসান (মানুষ) বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতিরেকে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকাজ করে, এবং তারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও তা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট ক্লেশ ও বিপদ আপদে) একে অপরকে ধৈর্যের ও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে।' (১০৩ঃ২-৪)।

আবারও- ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۝

'অতঃপর,সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয়।' (৯০ঃ১৮)।

যোগ্যতমের উত্তরণ

পবিত্র কোরআনের মতে, কোন বাণীর উত্তরণ ও তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে তার যুক্তি প্রমাণের সারবত্তার উপরে, তার বস্তুগত বল-বিক্রমের উপরে নয়। এ বিষয়টাতেও পবিত্র কোরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। এই গ্রন্থ ঘোষণা করে যে, সত্যকে উৎখাত করার এবং মিথ্যাকে সমর্থন করার জন্য যদি সর্বাপেক্ষা প্রচন্ড শক্তি ও বল প্রয়োগ করাও হয়, তাহলে সেই প্রচেষ্টা প্রতিবারই পরাজিত ও ব্যর্থ হবে। যুক্তি সব সময়েই বস্তুগত অস্ত্রের নিষ্ঠুর শক্তির উপরে বিজয় লাভ করবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ
ٱلصَّٰبِرِينَ ۝

'কিন্তু যারা বিশ্বাস রাখতো যে, তারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করবে, তারা বললো, কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপরে জয়যুক্ত হয়েছে, এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (২ঃ২৫০)।

উল্লিখিত ঐশী আদেশের প্রেক্ষিতেই ইসলামী আধিপত্য ও প্রাধান্যের ধারণাকে অনুধাবণ করতে হবে।

কোরআন শরীফের অন্য একটি আয়াতের এক অংশে বলা হয়েছেঃ

رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ
حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝

'তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্র দল, জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।' (৫৮ঃ২৩)।

বদরের যুদ্ধের সময়ে (বদরযুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ) মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল মুসলমানদের একটা ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে। এই ক্ষুদ্র দলটির সংখ্যার তুলনায় মক্কার মুশরেকদের সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল বিপুল; মুসলমানদের অস্ত্রের তুলনায় ওদের অস্ত্রও যুদ্ধ-সামগ্রী ছিল প্রচুর। এবং ওরা মুসলমানদেরকে বাধ্য করেছিল একটা অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। এবং মুসলমানরা সেই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিল তাদের আদর্শ রক্ষার জন্য, জান বাঁচাবার জন্য নয়। এর উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে পবিত্র কোরআন বলেছেঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ
وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

'..... যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলীল প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।' (৮ঃ৪৩)।

এটাই হচ্ছে সেই চিরস্থায়ী নীতি যা মানবজাতির বিবর্তনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বাণীর মর্ম হচ্ছে যোগ্যতমের উত্তরণ। বস্তুতঃ, এটাই হচ্ছে জীবনের বিবর্তনের নীতি-পদ্ধতি।

বাক্-স্বাধীনতা

বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন মানুষের মর্যাদা পুনঃস্থাপনের জন্য অপরিহার্য তেমনি তা অপরিহার্য কোন বাণীর প্রচারের জন্যেও। কোন ধর্মই

যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, যদি না তা নিজে মানবীয় মর্যাদা পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণের কথা বলে।

যা অতীত হয়ে গেছে তারই আলোকে এটা তো পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, ইসলামের ন্যায় একটি ধর্মের পক্ষে বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। অপর পক্ষে, বস্তুতঃ, ইসলাম এমনভাবে এবং এমন জোরের সঙ্গে এই নীতিকে সমর্থন করে, যা পৃথিবীতে অন্য আর কোন মতাদর্শে বা ধর্মে কদাচিৎ দেখা যায়।দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেঃ

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَٰدِقِينَ ۝

'এবং তারা বলে, যারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান তারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের একটা বৃথা আকাঙ্খা মাত্র। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' (২ঃ১১২)

আবার,-

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ
وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۝

"তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? তুমি বল, 'তোমরা নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহা (এই কোরআন) তাদের জন্যেও মর্যাদার কারণ যারা আমার সঙ্গে আছে এবং তাদের জন্যেও মর্যাদার কারণ যারা আমার পূর্বে অতীত হয়ে গেছে।' কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে চিনে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (২১ঃ২৫)।

এবং

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

"এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী বের করে আনব, অতঃপর বলবো, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তারা জানতে পারবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহ্‌র জন্য, এবং যা কিছু তারা রটনা করতো, তা সমস্তই তাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে যাবে।" (২৮ঃ৭৬)।

এবং أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۝ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

"তোমাদের নিকট কি কোনও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? সুতরাং, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর।" (৩৭ঃ১৫৭,১৫৮)

সমসাময়িক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ও মুক্তি

স্বাধীনতা ও মুক্তি - দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন তাৎপর্য ও তীব্রতাসহ উচ্চারিত হচ্ছে এবং তা সারাটা বিশ্বকেই প্রভাবান্বিত করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ এখন স্বাধীনতার গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে উত্তরোত্তর সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠছে। মুক্তির জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই একটা তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু কোত্থেকে তা সম্ভব হবে? তাকি সম্ভব হবে বিদেশী শাসনের জোঁয়াল থেকে? তা কি সম্ভব হবে একনায়কত্ব থেকে? ধর্মতান্ত্রিক অথবা সর্বময় ক্ষমতার দর্শন থেকে? নিপীড়নকারী গণতন্ত্র থেকে? দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র থেকে? ধনী দেশগুলির দ্বারা গরীবদেশগুলোর গলাচিপা অর্থনীতি থেকে? অজ্ঞতা থেকে? কুসংস্কার থেকে? অন্ধ বস্তুপূজা থেকে?

ইসলাম এই সমস্ত ব্যাধি থেকেই মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু, এমন কোন পন্থায় নয় যাতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং যাতে প্রতিহিংসার কারণে নির্বিচারে নির্দোষ ও নিরীহদের জন্য দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ ইসলামের বাণী হচ্ছে ঃ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

'আল্লাহ কলহ-বিশৃঙ্খলা ভালবাসেন না।' (২ঃ২০৬)।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মগুলির মতই দেওয়া-নেওয়ার নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ স্বাধীনতার উপরেই জোর দেয়। নিরংকুশ স্বাধীনতার ধারণা সমাজের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে একটা ফাঁকা, উদ্ভট ও অবাস্তব ধারণা। অনেক সময় স্বাধীনতার এই ধারণাকে এমনভাবে ভুল বুঝা হয়, এবং এমনভাবে তার অপপ্রয়োগ করা হয় যে, তখন বাকস্বাধীনতার কাংখিত নীতির সৌন্দর্য রূপান্তরিত হয়ে যায় এক কদর্য স্বাধীনতায় গালাগালির স্বাধীনতায়, অবমাননার স্বাধীনতায় এবং ঈশ্বরনিন্দার স্বাধীনতায়।

ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy)

মানুষকে বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সব ধর্মের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতিগতভাবে ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য কোন দৈহিক শাস্তিদানকে সমর্থন করে না, যদিও তা সমসাময়িক বিশ্বের সবাই, সাধারণভাবে সমর্থন করে থাকে।

গভীর মনোযোগ সহকারে, ব্যাপকভাবে বার বার কোরআন শরীফ পাঠ করেও আমি তার মধ্যে এমন একটি আয়াতও পাইনি যাতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরনিন্দা মানব প্রদত্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যদিও পবিত্র কোরআন অতি কঠোর ভাষায় অশিষ্ট আচরণ ও অশালীন কথাবার্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, অন্যদের অনুভূতিতে, কারণ থাক আর না থাক, আঘাত করার বিরুদ্ধে বলেছে, তথাপি ইসলাম না তো ইহজগতে ঈশ্বরনিন্দার শাস্তিদানকে সমর্থন করেছে, না সেই ক্ষমতা কাউকে দান করেছে।

পবিত্র কোরআনে ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা হয়েছে পাঁচ বারঃ

(১) দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ অর্থে বলা হয়েছে এভাবেঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

"এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ সম্বন্ধে শুন যে, ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ঐগুলির প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে বসিও না, যে পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, অন্যথায় সে ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদেরই মত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মুনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" -(৪ঃ১৪১)।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

"এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসবে না।" -(৬ঃ৬৯)।

ঈশ্বরনিন্দার জঘন্য খারাপীর বিরুদ্ধেও কী সুন্দর প্রতিক্রয়া!

ইসলাম ঈশ্বরনিন্দা বা ধর্মনিন্দাকারীকে শাস্তিদানের ক্ষমতা কোনও মানুষের হাতে তুলে দেয় না। শুধু তাই নয়, ইসলাম এই কথাও বলে যে, যেখানে বা যে সভায় ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়, হাসি-ঠাট্টা করা হয়, সেই স্থান থেকে সাময়িকভাবে উঠে এসো বা ওয়াক-আউট করে ধর্মনিন্দা বা ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাই শ্রেয়ঃ। সরাসরি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তো দূরস্থান, কোরআন করীম ঈশ্বরনিন্দাকারীদেরকে বরাবরের জন্য বয়কট করবার কথাও বলে না। পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে যে, এইরূপ বয়কট ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে পারবে যতক্ষণ না সেই ঈশ্বরনিন্দা বন্ধ হয়।

(২) আবারও, ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা হয়েছে সূরা (অধ্যায়) আল্-আনামে। এখানে, আনুমানিকভাবে, ঈশ্বরনিন্দার প্রশ্নটি শুধু আল্লাহ্‌র সম্পর্কেই আলোচিত হয়নি, বরং তা আলোচিত হয়েছে মূর্তি ও পূজা-অর্চনার কল্পিত সব বস্তু সম্পর্কেও। এইরূপ কোরআনী সৌন্দর্য দর্শনেও যে কেউ অভিভূত না হয়ে পারে না, যখন সে পড়েঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার দরুন শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্মকে মনোরম করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর দিকে তাদের প্রত্যাবর্তান ঘটবে, তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করতো তৎসম্বন্ধে অবহিত করবেন।" (৬ঃ১০৯)।

এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের মূর্তিগুলোর এবং কল্পিত দেবতাগুলোর নিন্দা করতে। এখানে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কেউ যদি অনুরূপ কাজ করে বসে, তাহলে অন্যেরাও, প্রতিশোধমূলকভাবে, আল্লাহ্‌রই নিন্দায় রত হতে পারে। এই অনুমাননির্ভর আলোচনায় খোদা এবং মূর্তি বা দেবতাদের সম্পর্কে সমান শর্তে কথা বলা হয়েছে। এবং কোন ক্ষেত্রেই কোন দৈহিক শক্তির কথা বলা হয়নি।

এই শিক্ষার নীতি গূঢ়ও গভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। কেউ যদি কারো আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করে, তাহলে, দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার জন্মাবে সমান প্রতিশোধ গ্রহণের, তা তার ধর্মবিশ্বাস , সত্য বা মিথ্যা,যা-ই হোক না কেন। কেউই অন্যভাবে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এথেকে, যেকেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে যে, আধ্যাত্মিক অপরাধের প্রতিশোধ আধ্যাত্মিক পন্থাতেই নিতে হবে, ঠিক যেমন দৈহিক অপরাধের বিরুদ্ধে দৈহিক প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, । কিন্তু, কোনক্ষেত্রেই সীমালংঘন করা যাবে না।

(৩) পবিত্র কোরআনে হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কৃত নিন্দার (ঈশ্বরনিন্দার) কথা বলা হয়েছেঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

"এবং তাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে।" (৪ঃ১৫৭)

এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের ঐতিহাসিক গোঁড়ামীর কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত অনুসারে, ইহুদীরা মরিয়ম (আঃ)-কে অসতী বলে এবং ঈসা (আঃ)-কে একটি সন্দেহজনকভাবে জন্মগ্রহণকারী শিশু বলে একপ্রকার জঘন্য ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ করেছে। এই আয়াতের আরবী শব্দ 'বুহতানান আযীমা' (যার অর্থ করা হয়েছে 'ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ') দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইহুদীদের এই আহাম্মকীর নিন্দা করা হয়েছে।

(৪) একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হযরত মরিয়ম এবং ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কাজ করার অপরাধের জন্য ইহুদীদেরকে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন করীম খৃষ্টানদেরকেও তিরস্কার করেছে এই জন্য যে, তারাও ঈশ্বর নিন্দার অপরাধে অপরাধী। কেননা, তারা দাবী করে যে, এক মানবী স্ত্রীর গর্ভে খোদার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টা কোরআন করীম জঘন্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে। তবু, এখানে না কোন দৈহিক শাস্তির কথাও বলা হয়েছে, না খোদাতা'লার বিরুদ্ধে নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তিদানের অধিকার কোন মানুষ বা মানবীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, এবং তাদের পিতৃপুরুষদের ও (ছিল না)। এ অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে"। (১৮ঃ৬)।

(৫) সবশেষে, আমি সব চাইতে স্পর্শকাতর বিষয়টির কথা বলতে চাই - স্পর্শকাতর এই অর্থে যে, আজকের দিনের মুসলমানরা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) বিরুদ্ধে নিন্দার (ব্লাসফেমী) ব্যাপারে যতটা স্পর্শকাতর, ততটা স্পর্শকাতর অন্য আর কারও বিরুদ্ধে নিন্দার ব্যাপারে নয়, এমনকি খোদার নিন্দার বিরুদ্ধেও নয়।

তবু, এখানে এমন একটা ভয়ানক ঈশ্বরনিন্দার ঘটনার কথা বলা যায়, যার উল্লেখ কোরআন করীমে করা হয়েছে, যা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কিত- যাকে ইসলামের ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে মুনাফেকদের নেতা বলে।

একবার একটা যুদ্ধের অভিযান থেকে ফেরার সময়, আব্দুল্লাহ বিন উবাই অন্যান্যদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই, মদীনাবাসীদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেখানকার সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ
مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ
ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

"তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিস্কার করে দেবে, অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল এবং মুমেনদের জন্য; কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়। (৬৩ঃ৯)

অভিযাত্রীদের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, এই অবমাননাজনক কথা সে বলছে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে। তারা ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাইকে তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

প্রামাণ্য বর্ণনায় আছে যে, এই ঘটনায় উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন উবাইর পুত্র রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে স্বহস্তে তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। সেই পুত্র এই যুক্তি দেখালো যে, যদি অপর কেউ তার পিতাকে হত্যা করে তাহলে, হতে পারে,

পরবর্তীকালে সে অজ্ঞতাবশতঃ, তার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করবে। শত শত বৎসর ধরে আরবদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছিল যে, তারা তাদের নিজেদের এবং নিকট আত্মীয়দের সামান্য অপমানেরও প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। সম্ভবতঃ, এই প্রথার কারণেই ঐ পুত্রটি তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) না তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, না তিনি তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেই মুনাফেক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে কোন প্রকারের কোন শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন। (ইবনে হিশাম কতৃক বর্ণিতঃ ইবনে হাশিমঃআস্ সিরাতুন নব্বীয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৫৫)।

ঐ অভিযান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আব্দুল্লাহ বিন উবাই শান্তিতেই বসবাস করছিল। অবশেষে, যখন সে স্বাভাবিকভাবে মারা গেল, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো যে, হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্র ছেলেকে তাঁর (সাঃ) নিজের পিরহান (শার্ট) দিলেন এবং তা দিয়ে তার পিতার কাফন তৈরী করতে বললেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজের জামা দান করার এই ব্যাপারটি এমন একটি অনন্য সাধারণ আশীর্বাদ ছিল যার বদলাতে সাহাবীগণের যে কেউ আব্দুল্লাহ্র পুত্রকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিতেও কুন্ঠাবোধ করতেন না। শুধু তাই না, রসুলে পাক (সাঃ) তার জানাযার নামাযে ইমামতী করার জন্যেও তৈরী হয়ে গেলেন। এতে সাহাবীদের অনেকেই নিশ্চয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে থাকবেন, বিশেষতঃ, যাঁরা আব্দুল্লাহ্র উপরোক্ত জঘন্য অপরাধকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ), যিনি পরবর্তী কালে আহযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন, তিনি সাহাবীদের সেই চাপা মর্মবেদনাকে, অবশেষে, ব্যক্ত না করে পারলেন না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন নামাযে জানাযার জন্য রওয়ানা হলেন, তখন হযরত উমর (সাঃ) হঠাৎ এগিয়ে গেলেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর (সাঃ) সিদ্ধান্ত বদলাবার অনরোধ জানালেন। এবং এটা করতে গিয়ে হযরত উমর (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে কোরআন পাকের একটি আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যে আয়াতে এমন কিছু সংখ্যক মুনাফেকের প্রতি ইংগিত করা

আছে যাদের ক্ষমার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) সত্তুর বার প্রার্থনা বা শাফায়াত করলেও তা কবুল করা হবে না বলে বলা হয়েছে। (প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, সত্তুর সংখ্যাটিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না কেননা, আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী, অধিক সংখ্যা বুঝাতে জোর দেওয়ার জন্যই সত্তুর সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়।)

যাহোক, রসূলে পাক (সাঃ) একটু মুচ্‌কী হাসলেন এবং বললেনঃ উমর, পথ ছাড়, আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি। যদি আমি জানতে পারি যে, আমি সত্তুর বার তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করবেন না তাহলে, আমি তার জন্যে সত্তুর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবো। অতঃপর, রসূলে করীম (সাঃ) সেই জানাযার নামাযের ইমামতী করলেন। (বুখারীঃ ২য় খন্ড, কিতাব আল্‌ জানায়েযা, পৃঃ ১২১, এবং বাব আল্‌ কাফন, পৃঃ ৯৬,৯৭)।

এই ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে একটি যথোচিত জবাব, যারা গলা ফাটায়ে চীৎকার করে যে, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) নিন্দাকারীদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।

এবং এটাই সেই ধর্ম, যা, অবশ্যই, দুনিয়ার বুকে আন্ত-ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে।

আন্ত-ধর্মীয় সহযোগিতা

আন্ত-ধর্মীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

"কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে প্রতিরোধ করেছে, তোমাদেরকে যেন সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাক্ওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর,নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (৫ ঃ ৩)।

ধর্মীয় বিদ্বেষবশতঃ কেউ যদি শত্রুতা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে থাকে, তবু পবিত্র কোরআন মুসলমানদের সেই সব শত্রুর বিরুদ্ধেও অবিচারমূলক আচরণ করার অনুমতি দেয় না।

আমরা এখন সেই সব কাফির বা অবিশ্বাসীদের কথা বলবো যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় শত্রুতায় জড়িত ছিল বলে জানা যায় না। তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পবিত্র কোরআন মুমিনদেরকে বলেছেঃ

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
۞ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞

"ওদের মধ্য থেকে যাদের সঙ্গে তোমাদের (আপাততঃ) শত্রুতা রয়েছে, তাদের ও তোমাদের মধ্যে, অচিরেই আল্লাহ্ মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

"যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করেনি তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায় বিচার করতে নিষেধ করেন না; নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।"(৬০ঃ৮,৯)।

মুসলমানদেরকে এই শিক্ষাদান করা হয়েছে যেন তারা আহলে কিতাব বা গ্রন্থানুসারীদেরকে আমন্ত্রণ জানায় এবং যেন তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র একত্ব -যে

বিশ্বাস করাও পোষণ করে -প্রচারে সহযোগিতা করে। নিম্নোক্ত আয়াতটিরও মর্ম হচ্ছে,-এখানে বিভেদ সৃষ্টিকারী মত পার্থকের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়নি, বরং এখানে সকলের মধ্যেকার সাধারণ একটা বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে পারস্পরিক কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছেঃ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ۝

"তুমি বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া কারো এবাদত না করি এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে আমরা শরীক না করি, এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভুরূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে, তোমরা বল 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্র নিকটে) আত্মসমর্পণকারী।" (৩ ঃ ৬৫)

উপসংহার

পৃথিবীর অকৃত্রিম বা বোনাফাইডি ধর্মগুলো মানুষকে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি দিতে সক্ষম কি না, তার একটা অর্থবহ পরীক্ষা চালাবার আগে, এটা অত্যন্ত জরুরী যে, সেই ধর্মগুলো তাদের স্ব স্ব অনুসারীদের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ফের্কার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করছে তা পরখ করে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে এটাও বিচার করে দেখা দরকার যে, সেই ধর্মগুলো সেগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা কালীন -অন্যদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। বস্তুবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষিতে বিচার করে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজেরই আধ্যাত্মিক আনন্দের পরিবর্তে ইহজাগতিক ও

ইন্দ্রিয়জ সুখের প্রতি ধাবিত হওয়া লক্ষ্য করে, হয়তো কেউ এইরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইবেন যে, ধর্মকে আর জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য করা উচিত নয়, বরং তা উপেক্ষা করাই উচিত।

আমি দুঃখিত যে, এইরূপ একটা সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত হতে পারছি না। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে, অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে, সংশোধিত ও উন্নত করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম আমাদের বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় কোন কল্যাণকর ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে না বরং তা শক্তিশালী নেতিবাচক ভূমিকাই পালন করে যাবে। ধর্মের পক্ষে তো এটাই করণীয় ছিল যে, তা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে, বিভিন্ন শ্রেণী ও ফের্কার অনুসারীবৃন্দের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝি দূর করবে, শালীনতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, 'নিজে বাচঁ এবং অপরকে বাঁচতে দাও' নীতির বাস্তবায়ণ করবে কিন্তু, তা না করে, তার পরিবর্তে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, ধর্ম সমকালীন সময়ে পৃথিবীর সবত্রই শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অতি নগণ্য ও তাৎপর্যহীন ভুমিকাই পালন করছে অবশ্য, তেমন কোন ভুমিকা যদি আদৌ কোথাও তা পালন করেই থাকে। পক্ষান্তরে, এই বিষয়টাকে কোনমতেই ছোট করে দেখা ঠিক হবে না যে, বিশৃংখলা সৃষ্টিতে, রক্তপাত ঘটাতে, দুঃখ দৈন্য এবং অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্ম এখনও একটা অত্যন্ত সক্ষম ও গতিশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই মারাত্মক সমস্যাটির সমাধান দিতে না পারলে, এবং এর ত্রুটিগুলো দূরীভূত করতে না পারলে, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনও পরিকল্পনাই গ্রহণ করা যাবে না। অভ্যন্তরীণভাবে কোন ধর্মের কোন একটা সম্প্রদায় তা যদি সেই ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত একটি সংখ্যালঘু দলও হয় তথাপি তার বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে, ধর্মীয় অনুভূতিকে দারুণভাবে উত্তেজিত এবং কর্মতৎপর করে তোলা সম্ভব।

সারাটা মুসলিম ইতিহাসই অনুরূপ কুৎসিত ও ঘৃণ্য ঘটনাবলী দ্বারা ভরপূর হয়ে আছে। শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকেই ব্যবহার করা হয়েছে নির্দোষ মুমিনদের জীবনের শান্তি নষ্ট করবার কাজে। এই মুমিনদের অপরাধ হচ্ছে, এরা ইসলামে বিশ্বাসী হলে কি হবে, এরা তো ওদের মত করে বা ওদের স্টাইলে

বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ, ইসলামের ইতিহাসের গবেষণায় এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামকে স্বয়ং মুসলিমদেরই উপরে নির্যাতন চালাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বিগত চৌদ্দশ'বছরে মুসলমানরা যে সমস্ত জিহাদ খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী ও অনেক বড় বড় 'জিহাদ' মুসলমানরা চালিয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

এই অধ্যায়টা যে শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। এখন পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যা ঘটছে এবং অতটা ঘন ঘন না হলেও সংখ্যালঘু শিয়াদেরও বিরুদ্ধে যা ঘটছে, তা-ই এই সত্যের প্রতি সৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট যে, এই জঘন্য সমস্যটার মৃত্যু অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে তাকালে মনে হতে পারে যে, খৃষ্টানদের হাতে খৃষ্টানদের নির্যাতিত হওয়ার যে ইতিহাস তা অনেক পুরানো হয়ে পড়েছে এবং তা ইউরোপীয় ও আমেরিকান ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু, বিষয়টার ভিন্ন চেহারা ফুটে ওঠবে তখন যখন আয়ার্ল্যান্ডের ধর্মজড়িত রাজনৈতিক বিবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যাবে। তাছাড়া, পৃথিবীর অনেক অনেক স্থানে, খৃষ্টান ধর্মের অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িক বিবাদের সমূহ আশংকা রয়ে গেছে, যারা বর্তমানে লিপ্ত হয়ে আছে ভিন্ন ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদে।

আন্ত-ধর্মীয় সম্পর্কের প্রতি তাকালে দেখা যাবে যে, ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা অথবা নাইজেরিয়াতে খৃষ্টান মুসলিম সংঘাত, অথবা মধ্য প্রাচ্যে ইহুদী-মুসলিম সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি লেগেই আছে। এই সব এবং অনুরূপ আরও অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাত বর্তমানে সুপ্ত বিপদাকারে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতই ধর্মজগতের গর্ভদেশে বিরাজ করছে।

বলাই বাহুল্য, এই সকল সমস্যা বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হচ্ছে তার সংশোধনের গুরুত্ব তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইসলামী পন্থায় কী করে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব সে কথাই আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমরা আমাদের কথায় ইতি টানবো।

(১) পৃথিবীর সকল ধর্ম, তা সেগুলো ইসলামে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, ইসলামের এই মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে যে, আন্ত-সাম্প্রদায়িক এবং আন্ত-ধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার জন্য কোন ক্রমেই বল প্রয়োগ করা যাবে না এবং নিপীড়ণ চালানো যাবে না। ধর্ম নির্বাচনের এখতিয়ার, তা ঘোষণা করার স্বাধীনতা, তার প্রচার, পালন এবং অনুশীলন করার অধিকার অথবা তা অস্বীকার বা বর্জন বা পরিবর্তন করার স্বাধীনতাকে নিরংকুশভাবে সংরক্ষিত করতে হবে।

(২) এমনকি, যদি অন্যান্য ধর্মগুলো সত্যের সার্বজনীনতার ধারণার সাথে একমত না হয়, এবং এমনকি যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহুদীবাদের অবস্থান থেকে খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম, হিন্দুধর্ম, জরথুষ্ট্রিয়ান ধর্ম ইত্যাদি সব ধর্মই যদি মিথ্যাও হয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের কিছুই করারও না থাকে, তবু অন্যত্র সত্যের এই অস্বীকার সত্ত্বেও, সকল ধর্মকে এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে যে, অপরাপর সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পবিত্র পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এমন না যে, এটা করতে গিয়ে তাদেরকে তাদের নীতিসমূহের ব্যাপারে আপোষ করতে হবে। এটা স্রেফ একটা মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়। প্রতিটি মানুষের এই অধিকারকে স্বীকার করতে হবে যে, তার ধর্মীয় আবেগ, তার ধর্মীয় অনুভূতি যেন লংঘিত না হয়, যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

(৩) মনে রাখতে হবে যে, উল্লিখিত নীতি কোন জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। এই নীতির সঙ্গে এটাও অনুধাবন করতে হবে যে, ঈশ্বরনিন্দার জন্য মানব-তৈরী শাস্তির কোন বিধান নেই। তবে, এর বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে হবে, এটাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এবং এই অশালীন, ন্যাক্কারজনক এবং ঘৃণ্য ব্যাপারটাকে নিন্দা করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে।

(৪) এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় যেভাবে আন্ত-ধর্মীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতো, তদ্রূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করাকে ব্যাপকভাবে

উৎসাহিত করতে হবে এবং তা বহুলাকারে করতে হবে। এই জাতীয় সম্মেলনের মূল ও অপরিহার্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে , তা হচ্ছে সংক্ষেপেঃ

ক) সকল বক্তাকেই এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তিনি যেন শুধু তাঁর নিজ ধর্মের ভাল ভাল কথাগুলি বলেন এবং আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি তুলে ধরেন, এবং এটা করতে গিয়ে তিনি যেন অপরাপর ধর্মগুলির বিরুদ্ধে কোন নিন্দা-বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন।

(খ) অবশ্য কোন ধর্মের কোন বক্তা চাইলে আন্তরিকভাবে অপরাপর ধর্মগুলিরও ভাল ভাল বিষয়গুলোর উল্লেখ করতে পারবেন, সেগুলোর উপরে কথা বলতে পারবেন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলতে পারবেন যে, কেন সেগুলি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে।

(গ) এক ধর্মের বক্তা অন্যান্য ধর্মের নেতাদের চরিত্র ও মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যেমন ধরুন, একজন ইহুদী বক্তা বলবেন রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলীর উপরে। এবং এই বিষয়টা এমন যে,তা সব মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রেখেই পসন্দ করবেন। একইভাবে, একজন মুসলিম বক্তা শ্রীকৃষ্ণের উপরে বলতে পারবেন, একজন হিন্দু বলতে পারবে যীশুখৃষ্টের উপরে, একজন বৌদ্ধ মূসার উপরে (আল্লাহ্‌র শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক তাঁদের সকলের উপরে) ইত্যাদি, ইত্যাদি। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতো আহমদীয়া সম্প্রদায় ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এবং এতে তারা অনেক সুফলও পেয়েছিল, সুখ্যাতিও অর্জন করেছিল।

(ঘ) উপরে (গ)-তে যা বলা হয়েছে, তার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না রেখেই বলছি যে, এই জাতীয় ধর্মীয় সভার বা আলোচনার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং তা করতে হবে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে মিলিতভাবেই। আন্ত-ধর্মীয় মতাদর্শের আদান-প্রদানকে কোনক্রমেই ধর্মীয় শান্তিতে অন্তর্ঘাত বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, বর্জন করা যাবে না। আলোচনার ধারা পদ্ধতি যদি মন্দ হয় তবে, তা বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আলোচনাকে কোনমতেই বাদ

দেওয়া যাবে না। চিন্তা ধারণা ও মতামতের অবাধ আদান-প্রদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার, এর প্রয়োজন যোগ্যতমের উত্তরণের জন্যই, এ ব্যাপারে কোনভাবেই আপোষ করা যায় না।

(৬) মতপার্থক্যের পরিসর সংকীর্ণ এবং ঐকমত্যের সম্ভাবনা সুপ্রসারিত করার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় যে, সকল ধর্মেরই উচিত হবে অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব ধর্মের বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক সীমিত করে ফেলা। সকল ধর্মের উৎস অভিন্ন, -কোরআন শরীফের এই ঘোষণাকে খাট করে দেখলে চলবে না। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা জ্ঞানের জগৎ। সেই জগতকে অন্যসকল ধর্মের উচিত নিজেদের সাথে এবং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে পরীক্ষা করে দেখা, পুংখানুপুংখভাবে খতিয়ে দেখা।

(৫) মানবজাতির পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সকল ভালকাজে এবং পরিকল্পনায় সহযোগিতাকে বাড়াতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, খৃষ্টান ও মুসলিম বা হিন্দু ও ইহুদী ইত্যাদি একসঙ্গে মিলেমিশে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট গ্রহণ করতে পারে।

এবং তাহলেই আমরা অতীতের ঋষিদের ও দার্শনিকদের সেই পুরনো ইউটোপিয়ান স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবো অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে - ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষকে একই পতাকার তলে একত্রিত করতে সক্ষম হবো।